The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXII, pp 369-383, ISSN 2306-3920

পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃগোষ্ঠী বয়নশিল্প : আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক তাৎপর্য এবং ক্ষয়িষ্ণুতার কারণ অনুসন্ধান

হৃদি আর্দ্রা আহমেদ*

[**সার-সংক্ষেপ** : বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠী জনজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বয়নশিল্প। নৃগোষ্ঠীর প্রয়োজন থেকেই তার বয়নশিল্পের উদ্ভব ঘটলেও কালে কালে এই বয়নশিল্প সমাজজীবনের নানাপ্রকার কৃত্য ও বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে শিল্প পদবাচ্য হয়ে ওঠে। তাই নৃগোষ্ঠী বয়ন যেমন প্রয়োজনজাত তেমনি এর সঙ্গে মিশে রয়েছে নৃগোষ্ঠীর আধিদৈবিক বিশ্বাস, ট্যাবু, ধর্মীয় বিভিন্ন রীতি-নীতি ও গোষ্ঠীগত সংস্কার। নৃগোষ্ঠী বয়নশিল্প বলতে বস্ত্রবয়ন ও বাঁশ-বেতের সাহায্যে নানাপ্রকার গৃহস্থালী সামগ্রী বয়নকেই বুঝে থাকি। নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা প্রকৃতি থেকে উপাদান-উপকরণ সংগ্রহ করে পছন্দ মত রং, ফর্ম, টেক্সচারের মিশেলে তাদের নিজস্ব রুচি অনুযায়ী পরম যত্নে তৈরি করে প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য সামগ্রী। তাই নৃগোষ্ঠী বয়নশিল্পে নৃগোষ্ঠী জনজীবনের সমষ্ঠিগত ভাবনার পরিচয় যেমন পাই তেমনি একজন বয়নশিল্পীর অন্তর্গত শিল্পভাবনার পরিচয়টিও খুঁজে পাওয়া যায়। নৃগোষ্ঠী জীবনে বস্ত্রবয়নশিল্প এমন একটি অবিচ্ছিন্ন সত্তা হিসেবে টিকে রয়েছে যে তাতে তাদের সাহিত্য, সঙ্গীত, নাট্য, প্রবাদ-প্রবচন ও লোকসাহিত্যে নানাভাবে বয়নপ্রসঙ্গ ও বয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষদের কথা উঠে এসেছে। হাজার বছর ধরে চলমান নৃগোষ্ঠী বয়ন প্রক্রিয়া একটি জাতিগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যকে অঙ্গীকরণ করে বিকশিত হয়েছে বিধায় এক নৃগোষ্ঠী থেকে অন্য নৃগোষ্ঠীর বয়নশিল্প স্বতন্ত্র রূপ পেয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে বিকাশমান বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃগোষ্ঠী বয়নশিল্প সময়ের প্রবহমানতা ও আর্থ-সামাজিক নানাবিধ কারণে ক্রমাগত বিলুপ্ত হওয়ার পথে ধাবিত হচ্ছে। তাছাড়া সস্তা ও চটকদার নানা বাহারি বস্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নৃগোষ্ঠী বস্ত্রশিল্পের টিকে থাকাটা দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। ফলে নৃগোষ্ঠীর বয়নশিল্প ক্রমাগত হুমকীর সম্মুখীন হচ্ছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের বয়নশিল্পের আর্থ-সামাজিক-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক তাৎপর্য আলোচনার প্রাসঙ্গিতায় নৃগোষ্ঠী বয়নশিল্পের ক্ষয়িষ্ণুতার কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে।]

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ও সমৃদ্ধ বয়নশিল্পের ধারায় নৃগোষ্ঠী বয়নশিল্প একটি স্বতন্ত্র শিল্পরীতি হিসেবে গড়ে উঠেছে। নৃগোষ্ঠীর বয়নশিল্প শুধু যে প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কিত তা নয় বরং নৃগোষ্ঠী জনজীবনের প্রয়োজন ও কৃত্যের মিশেলে গড়ে উঠেছে তাদের বয়নশিল্প। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত এ সকল জনগোষ্ঠী মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার কারণে ঘনিষ্ট যোগাযোগ তৈরি করতে পারে নি। ভাষা ও সংস্কৃতিগত প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি দুর্গম অঞ্চলে বসবাসের কারণেও মূল

* **ড. হৃদি আর্দ্রা আহমেদ :** খণ্ডকালীন শিক্ষক, কারুশিল্প বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জনগোষ্ঠী বাঙালির সঙ্গে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর স্থানগত দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে আফসার আহমদ বলেন—

> মূল জনগোষ্ঠীর নানাবিধ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে নৃগোষ্ঠী নরনারী ও তাদের সংস্কৃতি ক্রমশ মূল জনস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন ও বৃত্তাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এতদ্ব্যতীত, বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙালির সঙ্গে নৃগোষ্ঠীর ভাষা, বিবাহসংক্রান্ত প্রথা, জন্ম-মৃত্যুবিষয়ক সামাজিক ও ধর্মীয় কৃত্য, আচার-আচরণ, খাদ্য, সাংস্কৃতিক ও কৃষিপদ্ধতিগত দূরত্ব রয়েছে (আহমদ, ২০০৮ : ১)

নৃগোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে এদেশের বৃহত্তর বাঙালি জাতির বয়নশৈলীর পার্থক্য তৈরি হওয়ায় নৃগোষ্ঠী মানুষের জীবন-যাপনের ধরন এবং এদেশে অভিবাসনের কালে তারা যে সংস্কৃতি বহন করে নিয়ে এসেছিল সেই সংস্কৃতির প্রভাবও সক্রিয় ছিল। এভাবে নৃগোষ্ঠী বয়নশৈলীর বিকাশের সঙ্গে নিত্যপ্রয়োজন এবং জনজীবনের নানাবিধ কৃত্য, সামাজিক ট্যাবু, বিধিবিধান ও অঞ্চলগত প্রভাব জড়িয়ে রয়েছে। কালপরিক্রমায় বস্ত্রবয়নের সঙ্গে বয়নশিল্পীর সৌন্দর্যবাসনা যুক্ত হয়ে প্রয়োজন থেকে জাত নৃগোষ্ঠী বস্ত্রবয়নকে শিল্পের মানোচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। বাংলাদেশে বসবাসরত নৃগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে অধিকাংশই বয়নশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বস্ত্রবয়নের পাশাপাশি বাঁশ ও বেতের নানাবিধ গৃহস্থালী সামগ্রী তৈরির মাধ্যমে তারা নিজেদের প্রয়োজন মেটায়। বাঙালি ব্যতিরেকেও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নৃগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। এ সকল নৃগোষ্ঠী পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যের অনুষঙ্গেই বয়নশিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। এই ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে নৃগোষ্ঠীর আচরিত জীবনাচরণ, ধর্মীয় অনুষঙ্গ, সংস্কৃতি এবং লোকবিশ্বাসের অঙ্গীকরণের মাধ্যমে। বয়নশিল্পের সঙ্গে বিভিন্ন জাতি ও জাতিসত্তার মধ্যে প্রচলিত পৌরাণিক গল্প ও লোকপরম্পরার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বিদ্যমান। আর এই গল্পগুলো নানাভাবে নানাজাতির ঐতিহ্যবাহী বয়নের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে স্বতন্ত্র রূপাবয়ব পেয়েছে। বয়ন ইতিহাসকারের ভাষ্যে—

> পৃথিবীর প্রায় সকল জাতি সুতা তৈরি ও বস্ত্রবয়ন কারুকর্মের প্রথম সৃষ্টির স্বীকৃতি বা সুনাম দাবি করে থাকে। কিন্তু সত্য হলো, প্রতিটি প্রাচীন জনগোষ্ঠীরই এই শিল্প ঐতিহ্যে তাদের প্রশ্নাতীত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে এবং আজকের গৌরবময় পরিস্থিতি নির্মাণ করেছে। চীনারা তাদের সূক্ষ্মতায় আকর্ষণীয় ফুলজ নকশা এবং ড্রাগন, পারস্যের কিংখাব, ভারতের সুতির গাম্ভীর্য আর সুন্দর রেশম, মিসরের মিহি লিলেন এবং পেরুর বিচিত্র ট্যাপেস্ট্রি এবং তুলা ও রেশম বয়ন এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য (চন্দন, ২০১৪ : ১৮)।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে বস্ত্রবয়ন নিয়ে নানারকম মিথ কিংবা কিংবদন্তীর জন্ম হয়েছে বিভিন্ন জাতি এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে। প্রত্যেকেই মনে করে তারাই বয়নশিল্পের জন্ম দিয়েছে পৃথিবীতে। এ সকল বিশ্বাসের সঙ্গে নৃগোষ্ঠী জনজীবনের আদিম বিশ্বাসের পরম্পরার সম্পর্ক রয়েছে। বলা যেতে পারে বয়নশিল্প নিয়ে বাংলাদেশের অনেক নৃগোষ্ঠীর মধ্যেই নানা গল্প প্রচলিত রয়েছে। গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজজীবনে যে সকল কাহিনি তৈরি হয়ে থাকে তাতে কোনো ব্যক্তি নয় জনজীবনের বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে। এ প্রসঙ্গে তঞ্চঙ্গ্যা নৃগোষ্ঠীর বস্ত্রবয়নের একটি মিথ উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। পণ্ডিতদের অভিমত হলো—

> তঞ্চঙ্গ্যারা দেশভেদে তঞ্চঙ্গ্যা ও দাইনাক নামে পরিচিত। বস্তুত তঞ্চঙ্গ্যা ও দাইনাক নামে পাহাড়ে বসবাসকারী এই দুটি জনগোষ্ঠীকে আলাদা জনগোষ্ঠী হিসেবে মনে করা হলেও তারা একই জনগোষ্ঠীর লোক। তারা তিবেতো-বর্মন ভাষাভাষী নৃগোষ্ঠীর মানুষ, যদিও বর্তমানে তাদের ভাষা ভারতীয় আর্য ভাষার অন্তর্ভুক্ত। তঞ্চঙ্গ্যারা ভারত, বাংলাদেশ ও মায়ানমার এই তিনটি দেশের পার্বত্য সীমানা অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।

> বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলায় তঞ্চঙ্গ্যাদের প্রধান বসতিগুলো রয়েছে। (তঞ্চঙ্গ্যা, ২০১০ : ২৫২)

আদিকালে দাইনাকরা যখন উত্তর ব্রহ্মে বসবাস করতো সেই সময়ে বস্ত্রবয়ন বিষয়ক এই গল্পটি তৈরি হয়েছে। এই গল্পের মূল চরিত্র মংসুই বাস করতো মিরু নামের একটি জায়গায়। এই মংসুইকে নিয়েই তঞ্চঙ্গ্যাদের বস্ত্রবয়নের আদি গল্পটি হলো–

> দাইনাকরা যখন উত্তর ব্রহ্মের অধিবাসী ছিল তখন মিরু নামের একটি জায়গার নাম ও মংসুই নামীয় এক ব্যক্তির নাম খুবই আলোচিত ছিল তাদের মধ্যে। মংসুই নামীয় ঐ লোকটি হ্যাংলা, রোগা এবং দুর্বল ছিল। তা সত্ত্বেও সে ছিল খুবই উচ্চাভিলাষী এবং রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখতো। তার বন্ধু-বান্ধব বা আশপাশের লোকজনেরা তাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে বলতো 'তুমি এমন রোগা এবং দুর্বল লোক, কিভাবে রাজা হবে?' কিন্তু সে জোর দিয়ে বলতো যে, সে একদিন না একদিন রাজা হবে। তখন সবাই বলতো 'ঠিক আছে, যদি তুমি রাজা হবে তাহলে আকাশ থেকে রঙধনু ছিনিয়ে এনে দেখাও, এখনি রঙধনু ছিনিয়ে এনে প্রমাণ দিতে হবে।' কাছাকাছি অবস্থানকারী বনদেবতা তাদের এই কথোপকথন শুনেছেন। রাত্রে সেই দুর্বল অথচ উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবককে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বনদেবতা উপদেশ দিলেন 'তুমি আগামীকাল মিরুতে যাও, সেখানে পৌঁছেই দেখতে পাবে এক বৃদ্ধ মহিলা অক্লান্তভাবে দিবারাত্র কেবল কাপড় বয়ন করছে এবং তুমি তার কাছে গিয়ে সেই বৃদ্ধ মহিলা থেকে এক খণ্ড মনোরম কাপড় নিয়ে আসবে।' যুবক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে আন্তরিকভাবে আশ্বস্ত হলো এবং পরদিন ভোরে মিরুর উদ্দেশ্যে রওনা দিল কাউকে কিছু না বলে। মিরুতে পৌঁছে সত্যই দেখতে পেল এক বৃদ্ধ মহিলা অক্লান্তভাবে এক রংধনুর ন্যায় মনোরম কাপড় বুনছে। কাপড়টি থেকে উজ্জ্বল রশ্মি যেন বের হচ্ছে। যুবকটি বৃদ্ধ মহিলার নিকট তার বয়ন করা বস্ত্র চাইলে বৃদ্ধ মহিলা সন্তুষ্ট চিত্তে দিয়ে দিল। যুবকটি সেই মনোরম বস্ত্র খণ্ড গুটিয়ে এনে তার বন্ধুদের প্রদর্শন করে বললো, 'দেখ, আমি এই বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে রংধনুকে বেঁধে ফেলেছি। এখন থেকে তোমরা রংধনুকে দেখবে যখন আমি এই কাপড়টি গোটানো অবস্থা থেকে খুলে দেব।' তার বন্ধুরা তার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করলো। কেননা তারা তৎপূর্বে এরকম রং-বেরং সুন্দর বস্ত্র কোনদিন দেখেনি। পরবর্তীতে সেই যুবকটি সত্যি রাজা হলো এবং রাজা হবার পর তার জাতির মহিলাদের মধ্যে সেই বস্ত্র কেটে বন্টন করে দেয়। তখন থেকেই দাইনাক (বর্তমানে তঞ্চঙ্গ্যা) রমণীগণ এরকম মনোহর নকশার বস্ত্র (পিনুইন) পরিধান করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন (তঞ্চঙ্গ্যা, ২০১০ : ২৯২)।

এভাবে বয়নশিল্প নিয়ে জাতিভেদে যে সকল গল্পের তৈরি হয়েছে তাতে দেখা যায় যে প্রত্যেকেই বয়নশিল্পের প্রাচীন দাবীদার হিসেবে নিজের জাতিসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছে। বস্ত্রবয়নে ঐতিহ্যের এই যে অঙ্গীকরণ তাতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে বয়নশিল্পের সঙ্গে জাতি কিংবা জাতিসত্তার পৌরাণিক গল্প ও লোকপরম্পরার সম্পর্ক বিদ্যমান। আর এই লোকপরম্পরা গড়ে উঠেছে সংশ্লিষ্ট নৃগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় ও ভৌগোলিক অনুষঙ্গের মিশেলে। তাই নৃগোষ্ঠী বয়নশিল্পের শৈলীগত বিবর্তন কিংবা কালপ্রবাহে বয়নশিল্পের শরীরে ক্ষয়িষ্ণুতার যে চিহ্ন লেগেছে তার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে নৃগোষ্ঠীর বসবাস-অঞ্চলের ভূখণ্ডের গঠনগত-বৈচিত্র্য জানা প্রয়োজন। কালচারাল ইকোলোজি বা সাংস্কৃতিক বাস্তুসংস্থানের আলোকে ভূখণ্ডগত প্রভাবকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে নৃগোষ্ঠী বয়নশিল্পের সঙ্গে বসবাস-অঞ্চলের পরিবেশ, চাহিদা এবং সহজপ্রাপ্য প্রাকৃতিক সম্পদের একটি পরস্পরনির্ভর সম্পর্ক রয়েছে। কারণ 'সীমাবদ্ধ প্রযুক্তিপ্রাপ্ত মানুষের উপর প্রত্যক্ষভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রভাব ফেলে, কিন্তু শিল্পায়ন-সমৃদ্ধ মানব সমাজে তার প্রভাব ক্ষীণ সন্দেহ নেই' (চক্রবর্তী ও বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৯ : ১১১)। একই অঞ্চলে বাস করে কিন্তু জাতিগত পরিচয় ভিন্ন

এমন নৃগোষ্ঠী মানুষের বয়নশৈলীতেও ভিন্নতা সূচিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান– এই তিন পার্বত্য জেলার প্রধান প্রধান নৃগোষ্ঠীর বয়নশিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত কিংবদন্তী, লোকগল্প, কৃত্য, ট্যাবু এবং আর্থ-সামাজিক-ধর্মীয় ও ভৌগোলিক তাৎপর্য আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় নৃগোষ্ঠী বয়নশিল্পের ক্ষয়িষ্ণুতার কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা থাকবে।

বাংলাদেশের তিনটি পার্বত্য জেলায় চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, বম, পাংখো, লুসাই. খুমী, খিয়াং, চাক– এই এগারোটি নৃগোষ্ঠীর বসবাস। এ সকল নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা ও ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। দেখা গেছে একই অঞ্চলে বসবাসরত মারমা এবং খুমী কিংবা চাকমা এবং ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতিগত ভিন্নতা তাদের একটিকে আরেকটি থেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। এ সকল নৃগোষ্ঠীর 'শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, ভাষা ও সংস্কৃতি, প্রথা, সামাজিক রীতিনীতি, ভৌগোলিক পরিবেশ, আচার-অনুষ্ঠান, দৈহিক-মানসিক গঠন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনযাত্রা ইত্যাদি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী' (চাকমা ও মারমা, ২০১০ : ৫৮)। এই স্বাতন্ত্র্যের প্রভাব রয়েছে তাদের বয়নশিল্পে। এজন্য চাকমা বয়নশৈলীর সঙ্গে যেমন ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর বয়নশৈলীর পার্থক্য রয়েছে তেমনি বম এবং ম্রো কিংবা খুমী নৃগোষ্ঠীর বয়নশৈলীর মধ্যেও বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। শুধু যে বস্ত্রবয়নে এই পার্থক্য লক্ষণীয় তা নয়, নৃগোষ্ঠীর বাঁশ-বেতে নির্মিত গৃহস্থালী দ্রব্যাদির বয়নশৈলীতেও সূক্ষ্মতর পার্থক্য বিদ্যমান। এই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় পিঠে বহন করার ঝুড়ির নির্মাণশৈলীতে। আপাতদৃষ্টিতে একইরকম দেখতে মনে হলেও বুননের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। অধিকাংশ নৃগোষ্ঠী দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করে বিধায় এসকল গৃহস্থালী সামগ্রী বয়নের সঙ্গে প্রয়োজনের ধরনগত সাদৃশ্য রয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের নৃগোষ্ঠীর জীবিকার প্রধান উপায় ছিল জুমকৃষি। ক্যাপ্টেন টি. এইচ. লুইন এর *বাংলাদশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের আদিম জনগোষ্ঠী* গ্রন্থটিতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

> পাহাড়ী অঞ্চলে সব উপজাতি একই ধরনের কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। বাস্তবিকই সারা ভারতে যেখানে পাহাড়ী উপজাতিগুলো বসবাস করে সেখানেই এই বিশেষ চাষ পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া যায়। বার্মা এবং আরাকানে এটাকে 'টোং ইয়', মধ্য প্রদেশে 'ধাই-ইয়' বলা হয়। পক্ষান্তরে, এখানে পদ্ধতিটাকে সাধারণভাবে জুম বলা হয়। পাহাড়ী বা যারা এই কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ করে তাদেরকে জুম্ম বলা হয় (লুইন, ১৯৯৮ : ২০)।

জুমকৃষি নির্ভর নৃগোষ্ঠীর প্রয়োজনের ধরন এক বলেই গৃহস্থালী সামগ্রীর বয়নশৈলীর মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান কিন্তু নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও বিশ্বাসগত স্বাতন্ত্র্যের ছাপ এসকল বয়নশিল্পে দুর্নিরীক্ষ নয়। একই অঞ্চলে বসবাস করেও নৃগোষ্ঠীসমূহের সংস্কৃতিতে যে পার্থক্য সূচিত হয়েছে তার স্বরূপ অন্বেষণ করতে হলে নৃগোষ্ঠীসমূহের উৎস সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। মারমা নৃগোষ্ঠীর শব সৎকার অনুষ্ঠানের সঙ্গে বম নৃগোষ্ঠীর শব সৎকারের পার্থক্য বিদ্যমান। আবার বমদের *শিয়াকিডং* নৃত্যের সঙ্গে ম্রোদের গোহত্যা উৎসবের ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। কৃত্য ও সংস্কৃতির ভিন্নতার পরিচিহ্ন লেগে রয়েছে নৃগোষ্ঠীর বয়নশিল্পে। 'নৃগোষ্ঠীর জীবনাচরণ, আদিম সংস্কার ও ধর্মীয় বিশ্বাসের নানান অনুষঙ্গ নৃগোষ্ঠীর অন্তর্গত সত্তায় দৃঢ়মূলে প্রোথিত' (আহমদ, ২০০৮ : ৩২৩)। তবে বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীর বয়নশৈলীতে সাধারণভাবে মঙ্গোলীয় প্রভাব পরিদৃশ্যমান। কারণ বাংলাদেশের অধিকাংশ নৃগোষ্ঠী মঙ্গোলীয় মহাজাতির অন্তর্ভুক্ত জনগোষ্ঠী বিধায় তাদের অন্তর্মূলে সংস্থিত থাকে মূল ভূখণ্ডগত কিংবা জাতিগত প্রভাব। তবে দীর্ঘকাল বঙ্গীয় ভূখণ্ডে পাশাপাশি বসবাসের কারণে এ সকল নৃগোষ্ঠীর বয়নশিল্পে কাল প্রবাহে বসবাস-অঞ্চলে বিদ্যমান অন্যান্য অনিবার্য প্রভাবও পড়েছে। এ সকল প্রভাবের মধ্যে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙালি সংস্কৃতির দূরান্বয়ী প্রভাবের মাত্রাও কম নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসত্তাগুলোর সম্পর্কের দৃঢ় বন্ধন সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য–

> শত শত বছর ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাশাপাশি বসবাসের সূত্রে এই জাতিসত্তাগুলোর মধ্যে গড়ে উঠেছে সম্পর্কের এক দৃঢ় বন্ধন। অভিন্ন জীবিকা অর্জনের উপায় জুমচাষকে ঘিরে গড়ে ওঠা এই আত্মিক অভিন্নতাকে যেভাবে চিহ্নিত করা হয় তা হলো পার্বত্য জুমিয়া সংস্কৃতি।......আবার ঐক্যের ভেতরেও একধরনের পৃথক সত্তা এদের সকলের মধ্যে বিরাজমান (আসাদ, ২০১৪ : ১৪)।

এই পৃথক সত্তাটি নৃগোষ্ঠীর বয়নশিল্পে নানামাত্রায় শিল্পগত স্বাতন্ত্র্য ধরে রেখেছে। বিশেষ করে, নৃগোষ্ঠীর তাঁতীরা একই ধরনের কোমর তাঁতে যে বস্ত্রবয়ন করে থাকে তার ডিজাইন ও মটিফ নৃগোষ্ঠী ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট নৃগোষ্ঠী জনজীবনের অন্তরঙ্গীয় ও বহিরঙ্গীয় নানাবিধ উপাদান-উপকরণ ও কৃত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে বিধায় নৃগোষ্ঠীর বস্ত্রবয়নের নকশা ও মটিফ জাতিভেদে স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। নৃগোষ্ঠী শিল্পীরা সুতার সাহায্যে যেমন কাপড় বোনায় তেমনি বাঁশ, বেত, লতা-পাতা, পশুর চামড়া ফালি ফালি করে কেটে প্রয়োজনীয় গৃহস্থালী সামগ্রী বয়ন করে। বস্ত্রবয়নের মতই বাঁশ ও বেতের কাজেও নৃগোষ্ঠীর আদি ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃত্য ও গৃহস্থালী প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

একটা সময় ছিল যখন পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত প্রায় প্রতিটি নৃগোষ্ঠী পরিবার বস্ত্রবয়নের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু সময় বদলের সাথে সাথে মানুষের প্রয়োজনের ধরন পাল্টে যেতে থাকলে কোমর তাঁতে তৈরি বস্ত্রের গুরুত্বও কমে যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃগোষ্ঠী তাঁতীদের বস্ত্রবয়নের জন্য অন্য কারও দ্বারস্থ হতে হতো না। বস্ত্রবয়নের জন্য পাহাড়ে নিজস্ব জুমচাষে উৎপন্ন কার্পাস তুলা থেকে নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব পদ্ধতিতে সুতা তৈরির মাধ্যমে বস্ত্র বয়ন করা হতো। বনজ কাঠ সংগ্রহ করে নিজস্ব পদ্ধতিতে চরকা চরকী তৈরি করতো নৃগোষ্ঠী পরিবার। বাঁশের সাহায্যে বস্ত্রবয়ন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপকরণাদি নির্মাণ করতো কোমরতাঁতীরা। তারা বনজ ফল এবং প্রাকৃতিক উপাদান থেকে কাপড়ের রং তৈরি করতো। এভাবে নৃগোষ্ঠীর মধ্যে আত্মনির্ভরশীল যে বয়নপ্রক্রিয়া গড়ে উঠেছে তা সময়ের চলমানতার সঙ্গে বিকশিত ও পরিবর্তিত হয়েছে। অন্যদিকে বাঁশ ও বেতের গৃহস্থালী সামগ্রীর মধ্যে নানা ধরনের ঝুড়ি, ধান রাখার পাত্র, ঘরের বেড়া উল্লেখযোগ্য। নৃগোষ্ঠীর আটপৌরে জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বহন ও সংরক্ষণের জন্য ঝুড়ি অত্যাবশ্যকীয়। নৃগোষ্ঠীর ঝুড়িশিল্পের সঙ্গে মানব সভ্যতার আদি পর্বের ঝুড়ি নির্মাণের সাদৃশ্য বিদ্যমান। নৃগোষ্ঠী জনজীবনের এ সকল গার্হস্থ্য সামগ্রী আদিম সংস্কৃতির নমুনা। বাঁশ ও বেতের সাহায্যে হাতে বোনা এ সকল ঝুড়ি, বেড়া, মাছ ধরার সামগ্রী ঐতিহ্যের অংশ হয়ে আজও টিকে আছে পার্বত্য অঞ্চলের নৃগোষ্ঠী জনজীবনে। নৃগোষ্ঠী ভেদে এসকল ঝুড়ির বয়নে ভিন্ন ভিন্ন শৈলীর প্রকাশ ঘটেছে। শুধু নৃগোষ্ঠীর জীবনে নয়, মানব সভ্যতার সবচেয়ে প্রাচীনতম নমুনার অন্যতম এই ঝুড়িশিল্প সময়ের অনিবার্যতায় মিথ এবং মটিফ, ধর্ম এবং প্রতীকবাদিতায় পূর্ণ হয়ে নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক প্রত্নবৈশিষ্ট্য অঙ্গীকৃত করে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে স্থান করে নিয়েছে। নৃগোষ্ঠীর বয়নশিল্পের সঙ্গে আর্থ-সামাজিক-নৃতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক পরিমণ্ডল যে গভীরভাবে সম্পর্কিত তারও নমুনা বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদের ২৮ নং চর্যায় বিধৃত আছে।

‘উষ্ঞা উষ্ঞা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরাঙ্গ পীচ্ছ পরিহাণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী’ (মাহমুদ, ২০২১:৩০৩)

চর্যাপদে যে ভৌগোলিক পরিমণ্ডল ভূনির্মাণগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই তাতে দেখা যায় পাহাড়ী এলাকার মানুষের কারুশিল্পের বিবরণ উঠে এসেছে চর্যাকারদের রচনায়। উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় বসবাসরত এই মানুষগুলোর বাড়ির চারপাশে কার্পাস গাছে ফুল ফুটে আছে। এই বর্ণনায় যে মানুষগুলোর পরিচয় লভ্য তাদের সঙ্গে পাহাড়পুরে প্রাপ্ত চিত্রফলকে বিধৃত নারী-পুরুষের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আসলে এরা ছিল নিম্নশ্রেণির পাহাড়বাসী শবর, যারা শিকারের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ

করতো। এরা সাধারণত 'লতাপাতার পোশাক পরিধান করতো' (ভূঁইয়া, ২০০৩ : ১২১)। এতে প্রতীয়মান হয় যে লতা-পাতার তন্তু তৈরি করে এরা পোশাক নির্মাণ করতো। শুধু তাই নয়, বাঁশের তৈরি কুলা, চাঙারি, বেড়া ইত্যাদি তৈরি করার ক্ষেত্রেও তারা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে যার বিবরণ এ সকল সাহিত্যে লভ্য। চর্যাপদে যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাতে সংশ্লিষ্ট নিম্নশ্রেণির মানুষের প্রয়োজনের সঙ্গে ভূখণ্ডগত ও পরিবেশগত সাদৃশ্যের সম্পর্ক রয়েছে। চাকমা নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী আখ্যান 'রাধামন-ধনপুদী' পালায়ও দেখা যায় যে পাহাড়ে জুমচাষে যাওয়ার সময় নায়ক রাধামনকে নায়িকা ধনপুদি বস্ত্রবয়নের যন্ত্র তৈরির জন্য 'সুচ্চেক বাঁশ' আনতে বায়না করে। তাগলক, বকাদির প্রসঙ্গ নায়িকার বায়নায় উঠে এসেছে। এভাবে দেখা যায় যে বাঁশ ও বেতের সাহায্যে তৈরি গৃহস্থালী দ্রব্যাদি নির্মাণের প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনের সঙ্গে জাতিভেদে মিল রয়েছে কিন্তু কৃত্য ও মটিফের প্রয়োগে রয়েছে পার্থক্য। এ সকল পার্থক্য অনুসন্ধানের জন্য আর্থ-সামাজিক-ভৌগোলিক-ধর্মীয় ও নৃগোষ্ঠীর অঞ্চলগত পরিবেশের তাৎপর্য পর্যবেক্ষণ জরুরি। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃগোষ্ঠী বয়নশিল্পের সঙ্গে তাদের প্রয়োজনের সম্পর্কটাই অধিকতর গুরুত্ববহ। যে অঞ্চলে তারা বসবাস করে সেখানকার আবহাওয়া, কাজের ধরন ও জীবন-জীবিকার নানাবিধ অনুষঙ্গ মিলে নৃগোষ্ঠীর বস্ত্র কিংবা অন্য বয়ন কার্যক্রম বিকশিত হয়েছে। দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাস করে বিধায় বয়নের জন্য তারা মূলত নির্ভরশীল বনজ সম্পদের উপর। অঞ্চলগত আবহাওয়া ও আটপৌরে প্রয়োজন নৃগোষ্ঠীর বস্ত্রবয়নে টেক্সচারের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে। পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ী এলাকায় প্রচুর পরিমাণে তুলা চাষ হতো। এছাড়া পার্বত্য অঞ্চলে বনজ সম্পদ বাঁশ ও বেতের কোন অভাব নেই। এজন্য বস্ত্রের পাশাপাশি বাঁশ ও বেতের সাহায্যে নির্মিত গৃহস্থালী সামগ্রীর নির্মাণ করতো পাহাড়ি জনগণ। বয়নশিল্পের বিকাশে তুলা, বাঁশ. বেত, বনজ ঘাস, লতা ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপাদান ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে।

নৃগোষ্ঠী বস্ত্রবয়নশৈলী অঞ্চল কিংবা নৃগোষ্ঠীভেদে স্বতন্ত্র। এই যে বস্ত্রবয়নের স্বতন্ত্র ধারাটি তৈরি হয়েছে তা হঠাৎ কোন বিনির্মাণ নয়, একটি জনগোষ্ঠীর মানুষের সহস্র বছরের চর্চা ও পরিচর্যার ফসল। তবে এই শিল্পের সঙ্গে প্রয়োজন যতোটা নিবিড় শিল্পের সৃজন বাসনা ততোটা উচ্চকিত নয়। নৃগোষ্ঠী বস্ত্রবয়নের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবেই আলোচনা করা প্রয়োজন বস্ত্রবয়নের উদ্ভবের সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনের সম্পর্ক কতোটা নিবিড়। কারণ বস্ত্রের সঙ্গে মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। মানুষ যতো সভ্যতার দিকে ধাবিত হয়েছে ততোই বস্ত্র হয়ে উঠেছে প্রয়োজনের অপরিহার্য উপকরণ। সভ্যতার ঊষালগ্নে মানুষ প্রয়োজনের দাবি মেটানোর জন্য বস্ত্রবয়নের দিকে ঝুঁকেছিল। কিন্তু সময়ের প্রবাহে মানুষের ভেতরে সৌন্দর্যবোধের চাহিদা জেগে উঠার পর বস্ত্রবয়নে নানাবিধ রং ও নকশার প্রচলন ঘটতে থাকে। সৌন্দর্য পিপাসু মানুষের স্বাভাবিক শিল্পবোধ থেকেই নানারূপ অলংকরণ পদ্ধতির যে বিকাশ ঘটেছে তার সঙ্গে বস্ত্রবয়নের নন্দনতাত্ত্বিক অগ্রগতি ক্রমাগত প্রবল হতে থাকে। অর্থনীতি ও সামাজিক অগ্রযাত্রার সঙ্গে ক্রমশ সংস্কৃতির সংলগ্নতা শুরু হলে একসময় বস্ত্রশিল্পও অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের মত সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য হয়ে ওঠে। নৃগোষ্ঠী জনজীবনেও যে বস্ত্র ছিল শুধু প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কিত; তা-ই যখন ক্রমাগত নৃগোষ্ঠী মানুষের সৌন্দর্যবাসনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে থাকলো তখন থেকেই রং ও বয়নে পছন্দের বিষয়টি সামনে এগিয়ে আসে। প্রয়োজনের গর্ভ থেকে জাত বস্ত্রশিল্পের রং ও নকশার বিকাশের সঙ্গে সমাজ ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন তাই বস্ত্রবয়নকে শিল্পের পর্যায়ভুক্ত করেছে। নানা জাতি, উপজাতি, গোত্র ও সম্প্রদায়ের ভেতরে বস্ত্রবয়নের ধারাবাহিকতার সঙ্গে সমাজ ও সংস্কৃতির প্রবণতাগুলোকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে নৃগোষ্ঠী জনপদ এই দেশের স্থানের দিক থেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ। পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা পাহাড় ও অরণ্যের প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে বসবাস করে। যাতায়াতের দিক থেকেও দুর্গম বহু স্থানের নৃগোষ্ঠী শুধু নিজেদের জাতিসত্তার সঙ্গেই যোগাযোগ রাখে।

একই অঞ্চলে বসবাসরত অন্যান্য জাতিসত্তার সঙ্গেও ক্ষেত্রবিশেষে সামাজিক-সাংস্কৃতিক দূরত্ব বজায় রাখে। শুধু পাহাড়ী এলাকা নয়, সমতলের নৃগোষ্ঠী, বিশেষ করে ময়মনসিংহ অঞ্চলের গারো, হাজং, কোচ, পটুয়াখালী অঞ্চলের রাখাইন, সিলেট অঞ্চলের মনিপুরি, খাসিয়া এবং উত্তরবঙ্গের ওরাওঁ, সান্তাল, রাজবংশী, মালো, মাহাতো প্রভৃতি নৃগোষ্ঠী নিজেদের সংস্কৃতি ও সামাজিক পরিমণ্ডলে যুগযুগ ধরে বসবাস করছে। এসকল জাতিসত্তা দীর্ঘকাল পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য বজায় রেখেছে ভাষা, সংস্কৃতি, পোশাক এবং বস্ত্রবয়নশৈলী ও নকশা অঙ্কনে। কখনও দেখা যায় যে, কাপড়ের রঙের দিক থেকেও এরা নিজেদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছে বস্ত্রবয়নশৈলীতে। তাই গারো নৃগোষ্ঠীর নারীদের পরিধেয় বস্ত্র দকমান্দার সঙ্গে হাজং নৃগোষ্ঠীর মেয়েদের পোশাক পাতিনের রং ও টেক্সচারে পার্থক্য বিদ্যমান। স্থানগত ও সংস্কৃতিগত প্রভাব তাদের বস্ত্রের বয়নশৈলীকে প্রভাবিত করেছে। ফলে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, বম, তঞ্চঙ্গ্যা, খুমী, ম্রো প্রভৃতি নৃগোষ্ঠীর কাপড়ের টেক্সচার, রং ও বয়নশৈলীতে সংস্কৃতিগত প্রভাবের কারণে স্বতন্ত্র রূপ লাভ করেছে। তবে বান্দরবান অঞ্চলে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা যায় যে বম, লুসাই এবং পাংখোয়া নৃগোষ্ঠীর বস্ত্রবয়নশৈলীতে তেমন কোনো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নেই। আবার একই ময়মনসিংহ অঞ্চলে বসবাস করেও গারো এবং হাজং নৃগোষ্ঠীর বস্ত্রবয়নে ভিন্নতা সূচিত হয়েছে। শুধু বস্ত্রবয়ন নয়, বাঁশ বেতের বয়ন সামগ্রীও সমতল এবং পাহাড়ী অঞ্চলের নৃগোষ্ঠীভেদে শৈলীর দিক থেকে ভিন্ন হয়ে উঠেছে। ম্রোদের বাঁশ ও বেতের তৈরি পানির পাত্র বহনের ঝুড়ি, শস্য সংরক্ষণের জন্য বড় ঝুড়ি, পোশাক রাখার ঝুড়ি, ফুলের ঝুড়ি গঠনগত দিক থেকে প্রায় একই রকম হলেও বয়নশৈলীর দিক থেকে অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর সঙ্গে খানিকটা স্বতন্ত্র থেকে যায়। ম্রো পুরুষেরা নিজেরাই তাদের ঝুড়ি নির্মাণ করে। অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর মত ম্রোরাও বিশ্বাস করে `weaving is a man's job; and the baskets a man weaves are peculiar to his own ethnic group' (Brauns & Loffler, 1990 : 84) বয়ন পুরুষের কাজ–এই বিশ্বাস সকল নৃগোষ্ঠীর মধ্যেই বিদ্যমান। বাংলাদেশের উত্তর জনপদের সান্তাল, ওরাওঁ, ময়মনসিংহ অঞ্চলের গারো, হাজং, কোচ প্রভৃতি নৃগোষ্ঠীর বাঁশ-বেতের কাজের মধ্যে তাদের শিল্প দক্ষতা এবং শিল্প স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। গবেষকের মতে–

> ময়মনসিংহ অঞ্চলের 'হাজংরা বেত-বাঁশ দ্বারা পাটি, খালুই, মোড়া, ঝুলুংগা, পাখা, চাটাই, খাঁচা, টুকরি, মাথাল ইত্যাদি তৈরি করেন। উত্তর জনপদের রাজবংশীদের বাঁশের তৈরি বিদা(চিরুণি), ডালা, ছানি, খবরা, বারুন উল্লেখযোগ্য।......গারোরা পিঠে ব্যবহারের ঝুড়ি, কুলা, মদ তৈরির পাত্র ইত্যাদি বাঁশ থেকে তৈরি করেন (বিশ্বাস, ২০১৪ : ২৬৫)

বাংলাদেশের প্রত্যেকটি নৃগোষ্ঠীর এই শিল্পশৈলী ও শিল্প স্বাতন্ত্র্য বর্তমানে আধুনিক চাহিদা ও রুচির কারণে ক্রমাগত নিজস্বতা হারিয়ে প্রায় বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে। তবে একথা ঠিক যে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙালি সংস্কৃতির প্রবল প্রভাববলয়ে থেকেও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত নৃগোষ্ঠী জনগণ বস্ত্রবয়নে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছে। তবে কখনও কখনও আধুনিকতার প্রবাহে তারাও মূল বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে ক্রমশ সম্পর্কিত হয়ে উঠেছে। বাঙালি থেকে নৃগোষ্ঠী নরনারী শুধু আকৃতিগত দিক থেকেই পৃথক নয় তারা ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম এবং নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের কারণেও স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য নৃতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছে। এক নৃগোষ্ঠী থেকে অন্য নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি তাদের জীবন ও সামাজিকতাকে ভিন্ন করে দিয়েছে। সংস্কৃতির এই বহুমাত্রিকতার কারণে নৃগোষ্ঠী জনগণ যেমন বৈচিত্র্যমণ্ডিত হয়েছে তেমনি বাংলাদেশকে বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক ভিন্নতার দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে। তাদের জীবনযাপন ও জীবনাচরণের মধ্যে যে সাধারণ প্রবণতা রয়েছে তা সামাজিকভাবে নৃগোষ্ঠী জীবনযাপনের এবং নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগত সম্পর্কের

কারণেই সম্ভব হয়েছে। প্রত্যেক নৃগোষ্ঠীর এই স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন স্পষ্টভাবে বিধৃত তাদের বস্ত্রবয়নশৈলীতে। আর একারণেই বস্ত্রের বয়নশৈলীতে নৃগোষ্ঠী বয়ন কারিগরের জাতিগত বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য, কৃত্য এবং ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার পরিচিহ্ন বিদ্যমান। চাকমা নৃগোষ্ঠীর বস্ত্রবয়নের ক্যাটালগ নামে পরিচিত 'আলাম'-এ যে চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় তা চাকমা জনজীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাণি, লতা-পাতা, ফুল। এটি মূলত চাকমা নৃগোষ্ঠীর বস্ত্রবয়নের দলিল। এভাবে বেশিরভাগ নৃগোষ্ঠীর বস্ত্রবয়ন সমাজ ও পরিবারকেন্দ্রিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে প্রজন্মান্তরে বাহিত হয়ে এসেছে।

বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠী বয়নশৈলীতে আধুনিক সমাজ, চাহিদা, অর্থনীতি, রুচি ও সময়গত কারণে পরিবর্তন ঘটেছে। ক্রমাগত বদলে যাওয়া আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভাবে এই সময়ে এসে নৃগোষ্ঠী বয়নশৈলীতে জুম থেকে প্রস্তুত সুতার পরিবর্তে সিন্থেটিক, রেয়ন এবং বাজার চাহিদা বিবেচনায় রেখে বস্ত্রবয়নের প্রচলন শুরু হয়েছে। এর পেছনেও নৃগোষ্ঠী সমাজে বদলে যাওয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দায়ী। যে পার্বত্য চট্টগ্রামের আরণ্যক জনপদে অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল জুমকেন্দ্রিক কৃষিপদ্ধতি। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ নৃগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উৎস ছিল জুম। জুমচাষের পাশাপাশি বয়ন, পশুপালন ইত্যাদি নৃগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে খানিকটা ভূমিকা রাখতো (Selina Ahsan, 1995 : 64)। নৃগোষ্ঠীর জুমে যখন প্রচুর পরিমাণে তুলা চাষ হতো তখন নৃগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে তুলা ব্যাপক অবদান রেখেছে। উৎপাদিত তুলা নিজেদের বস্ত্রবয়নের প্রয়োজন মিটিয়ে সমতলের মানুষদের কাছে বিক্রয় করা হতো। এই তুলা চাষের কারণেই মুঘল থেকে শুরু করে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর নজরে এসেছিল পার্বত্য ভূমি। সেই সময়ে উৎপাদিত শস্যের যৎসামান্য পরিমাণ তারা মুঘল সম্রাটকে কর হিসেবে প্রদান করতো। সময় বদলের সাথে সাথে জুমকৃষির সংকোচন ঘটে এবং তুলা চাষ কমে যায় পার্বত্য অঞ্চলে। তাই কার্পাস থেকে সুতা প্রস্তুত করে বস্ত্রবয়নের সনাতন পদ্ধতি নৃগোষ্ঠী জনজীবনে ব্যাপকভাবে প্রচলনের সুযোগ এখন সংকুচিত। এছাড়া অর্থনীতি, সামাজিক ও যুগগত রুচির নানা পরিবর্তনের কারণে নৃগোষ্ঠী বয়নশিল্পী ক্রমে ক্রমে বস্ত্রবয়নে তার আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। জুমচাষের সঙ্গে নৃগোষ্ঠীর স্থানান্তরের একটি সম্পর্ক বিদ্যমান। পাহাড়িরা ফলনশীল উর্বর জুমভূমির সন্ধানে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে পরিভ্রমণ করতো বলে তাদের টেকসই স্থায়ী কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি। ফলে বস্ত্রবয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পীগণ অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার কারণে বস্ত্রবয়নকে পেশাগত কিংবা শিল্পগত মানোচ্চতায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য কোন সুযোগ তৈরি করতে সক্ষম হন নি। একই সঙ্গে এ কথাটিও বিবেচনায় রাখতে হয়েছে যে এই বস্ত্রবয়নের ধারাটি পরিবার এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক। কারণ একটি পরিবার কিংবা গোষ্ঠীর কিছু মানুষের মধ্যে যে বস্ত্রবয়নশৈলী তৈরি হয়েছে তা প্রায় সময়েই সেই গোষ্ঠীর মধ্যেই থেকে যায়। অন্য গোষ্ঠী কিংবা ব্যক্তির নিকট স্থানান্তরিত হয় না। একটি পরিবার কিংবা গোষ্ঠী থেকে যে নিজস্ব বস্ত্রবয়নশৈলীর উদ্ভব ঘটেছে তা অন্য শিল্পীর কাছে স্থানান্তরিত না হওয়ার কারণে বয়নশৈলীর ব্যাপক বিকাশ ঘটছে না। এভাবে সংকুচিত হয়ে থাকাটাও নৃগোষ্ঠী বয়নশৈলীর অবলুপ্তির গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে অনুমিত হয়। আবার এও দেখা গেছে যে নৃগোষ্ঠী বয়নশিল্পের অবলুপ্তিকে ত্বরান্বিত করেছে মেশিনের বস্ত্রের আমদানি। কারণ মেশিন অল্প সময়ে প্রচুর পরিমাণ কাপড় তৈরি ও সরবরাহ করতে সক্ষম। ফলে দ্রুত চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় কিন্তু নৃগোষ্ঠী শিল্পীর দক্ষতার ছিটেফোঁটাও সেখানে পরিলক্ষিত হয় না। নৃগোষ্ঠীর কোমরতাঁতে তৈরি বস্ত্রের সঙ্গে মেশিনে তৈরি বস্ত্রের তুলনা করে দেখা যায় যে, টেক্সচার, নকশা কিংবা রঙে হাতে তৈরি বস্ত্রের শিল্পসৌন্দর্যের আভাসমাত্র পাওয়া যায় না মেশিনে তৈরি বস্ত্রে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃগোষ্ঠী জনগণের জীবিকার মূল উৎস হচ্ছে জুমচাষ। এই জুমচাষ স্থানান্তরিত কৃষিপদ্ধতি হিসেবে গণ্য। পরপর কয়েক বছর চাষাবাদের পর জুমভূমি অনুর্বর কিংবা শস্য ফলানোর অনুপযুক্ত হয়ে পড়লে জুমচাষী নৃগোষ্ঠী জনগণ অন্য জুমভূমির সন্ধানে ভিন্ন পাহাড়ে চলে যায়। ফলে

পরিবারকেন্দ্রিক কোমরতাঁত শিল্পীদেরও স্থানান্তরিত হতে হয় পরিবারের সঙ্গে। এতে দীর্ঘকাল ধরে প্রজন্মের পর প্রজন্মের মধ্যে যে বয়নশৈলী চালু রয়েছে তা স্থানান্তরিত হয়। এইভাবে বস্ত্র শিল্পভাবনাটিও অন্য কোনো নৃগোষ্ঠীর মধ্যে বাহিত না হয়ে পরিবারকেন্দ্রিক গোষ্ঠীগত শিল্প হিসেবেই টিকে থাকে। এক্ষেত্রে কেউ ভাবতেই পারেন যে বস্ত্রবয়নের এই শৈলী আর পুনর্সৃজন সম্ভব নয়। কিন্তু ঐতিহ্যতো সচল একটি ধারা। কাজেই ঐতিহ্যের অনুষঙ্গরূপে যে শৈলীর বিকাশ ঘটেছে তা কেন পরিবর্তনকে অঙ্গীকৃত করে নতুন কালকে স্পর্শ করতে পারবে না? এই ভাবনাটির মূল নিহিত রয়েছে নৃগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে।

নৃগোষ্ঠী নারী কোমরতাঁতে যে বস্ত্র তৈরি করে তার গুরুত্ব নৃগোষ্ঠী অর্থনীতি ও সমাজে অপরিসীম। পারিবারিক জীবনে জুমচাষকেন্দ্রিক নৃগোষ্ঠী পরিবারে জুম তাদের একমাত্র আর্থিক অবলম্বন। এই পরিবারের মেয়েরা কোমরতাঁতে নিজেদের ও পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় পোশাক তৈরি করে। ফলে পরিবারের অর্থনৈতিক চাহিদার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই বয়নশিল্প। এছাড়া বর্তমানে ব্যাপকভাবে ব্যবসার নিমিত্তে নৃগোষ্ঠী বয়নশৈলীকে বৃহত্তর বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে তুলে ধরার জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে সেখানেও নৃগোষ্ঠী নারী কাজ করে। এর ফলে পরিবারের একটা বাড়তি আয়ের সংস্থান ঘটে নৃগোষ্ঠী নারী বয়নশিল্পীদের মাধ্যমে। এই যে বয়নকৌশল নারীরা আয়ত্ব করেছে তার সঙ্গে তাদের ঐতিহ্য ও নানারকম প্রথার সম্পর্ক রয়েছে। বস্ত্রবয়নে দক্ষ একজন নৃগোষ্ঠী মেয়ে সমাজে গুরুত্ব পেয়ে থাকে। ফলে ধারাবাহিকভাবেই তাদের কাছ থেকে পরবর্তী প্রজন্মের নারীরা প্রজন্মান্তরে এই বস্ত্রবয়ন শিক্ষা রপ্ত করে। এমনকি নৃগোষ্ঠী মেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রেও এই বস্ত্রবয়নে দক্ষতা মেয়েটির গুণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। আরশি ডি. রায়ের মতে—

> The significance of weaving throughout life cycle celebrations is still important especially in relation to a young woman's marriage and other rites of passage (Roy, 2005 : 35)

এই প্রবন্ধ রচনার পূর্বে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের সময় ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠী বস্ত্রবয়নকারীদের সাথে কথা বলে জানা যায় যে বস্ত্রবয়নের সঙ্গে তাদের ধর্মীয় ও ঐতিহ্যগত বিশ্বাস সক্রিয় থাকে। বান্দরবানের রোয়াংছড়িতে বড়দিন উপলক্ষে ঐতিহ্যবাহী পোশাকে সজ্জিত খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী দ্রৌপদী ত্রিপুরার সঙ্গে ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর বস্ত্রবয়ন, সাজসজ্জা এবং আচার অনুষ্ঠানে নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্য সংলগ্নতা নিয়ে বিশদ আলাপ করা হয়েছে। তাতে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর আদি জীবনাচরণ ও ঐতিহ্য বস্ত্রবয়নের সঙ্গে একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট। খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী হয়েও ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর এই নারী নৃগোষ্ঠীর আদি ঐতিহ্যের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। তবে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে আধুনিক রুচি ও চাহিদার ব্যাপক প্রভাবের কারণে নৃগোষ্ঠী বস্ত্র ও অলংকারের জনপ্রিয়তা ও প্রচলন ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। তিনি মনে করেন নৃগোষ্ঠী পোশাক ও অলংকার জনপ্রিয় করার জন্য সরকারের সাহায্য দরকার (সাক্ষাৎকার : দ্রৌপদী ত্রিপুরা, বয়স:৬০, ডাক ও থানা: রোয়াংছড়ি, বান্দরবান)। নৃগোষ্ঠী বস্ত্রের নকশার সঙ্গে নৃগোষ্ঠীর কৃত্য, ঐতিহ্য, জীবনবিশ্বাস ও আচারগত বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত সম্পর্ক রয়েছে। এভাবেই বস্ত্রবয়ন হয়ে ওঠে নৃগোষ্ঠীর প্রয়োজনের ও কৃত্যের অংশ। নৃগোষ্ঠীর জন্মমৃত্যু ও বিবাহ সংক্রান্ত বহুবিধ কৃত্যের সঙ্গে তাদের পোশাকের একটা সম্পর্ক রয়েছে। চাকমা নৃগোষ্ঠীর মধ্যে এখনও এই বিশ্বাস প্রবল যে, কোমরতাঁতে কোন অসম্পূর্ণ বুনন ফেলে রেখে শিশু জন্মদান খুবই মন্দভাগ্যের ব্যাপার। এমনকি বিজু উৎসবের পর পর্যন্ত সেই অসম্পূর্ণ বস্ত্র কোমরতাঁতে সংযুক্ত থাকাটাও চাকমারা খারাপ লক্ষণ বিবেচনা করে থাকে। বিজুসহ যে কোনো উৎসবে যেমন নতুন পোশাক পরিধান করা হয় তেমনি মৃতকে চিতায় তোলার পূর্বেই নতুন কাপড় পরিয়ে নেওয়া হয়। বান্দরবানের থানচি উপজেলার মারমা বয়নশিল্পী হ্লায়ই চিং মারমার সঙ্গে তাঁর কোমরতাঁতের কাছে বসে কৃত্য ও বস্ত্রবয়নের নানা কথা শুনা যায়। এই মারমা বয়নশিল্পী নিজের এবং ঘনিষ্ট আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুর পর যে বস্ত্র ব্যবহার করা

হবে তা বুনছিলেন। এটা হাতে বোনা কাফনের কাপড়ের মতো যা *খ্রে পছো* নামে পরিচিত। হ্লায়ই চিং মারমার নিজের জন্য এই কাপড় বোনার কৃত্যের সঙ্গে মারমা নর-নারীর কৃত্য ও ধর্মীয় বিশ্বাসের গভীর সম্পর্ক রয়েছে (হ্লায়ই চিং মারমা, বয়স : ৬৫)। মৃতের কৃত্যের সঙ্গে বস্ত্রবয়নের প্রথাটি ম্রো নৃগোষ্ঠীর মধ্যেও লভ্য। সুপ্রাচীন কাল থেকেই এই প্রথা নৃগোষ্ঠী জনজীবনের বিশ্বাসের সঙ্গে অঙ্গীকৃত থেকেছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞের মন্তব্য –

> Patterns, often consist, however, of rhomboid motifs and meanders, which in a similar form are also woven by the men into some of the baskets and especially into the mats used for a coffin (Brauns & Loffler, 1990 : 133)

নৃগোষ্ঠীর বস্ত্রবয়নের সঙ্গে এভাবেই তাদের আর্থ-সামাজিক-ভৌগোলিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতির সংশ্লেষ ঘটেছে। আর একারণেই নৃগোষ্ঠীর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সঙ্গে তাদের বস্ত্রবয়নের যে অভেদ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে তা শুধু অর্থনীতির সঙ্গেই নয়, তাদের কৃত্য ও জীবনবিশ্বাসের সঙ্গেও গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট এবং এর শেকড় প্রোথিত নৃগোষ্ঠীর সামগ্রিক সংস্কৃতির গভীরে। তাই নৃগোষ্ঠী বয়নশিল্পের বিলুপ্তির কারণ অনুসন্ধান তার আর্থিক অনটনের সঙ্গে নয় তাদের সামাজিক ও ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের ক্রমাগত বিপর্যয়কে বিবেচনাপূর্বক অনুসন্ধান করা সমীচীন। আর এজন্যই পারিবারিক ঐতিহ্যের অনুসরণে ধারাবাহিকভাবে যে বস্ত্রবয়নশিল্প নৃগোষ্ঠী নারীদের মধ্যে বহমান তা নারীর ব্যক্তিগত শিল্পদক্ষতা ও পারিবারিক ঐতিহ্যকেই প্রকাশিত করে। মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে রাঙ্গামাটির জম্বুদ্বীপে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থী দ্যানিস চাকমার বিবাহ অনুষ্ঠানে বর-কনেকে তুলা দিয়ে আশীর্বাদের প্রথাটি প্রত্যক্ষ করেছি। বস্ত্রবয়ন নৃগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনের কল্যাণময় দিকটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত বিধায় চাকমা বিবাহপ্রথার অবিচ্ছেদ্য রীতি হিসেবে এখনও টিকে রয়েছে। কারণ তুলা হচ্ছে বস্ত্রের প্রতীক এবং চাকমা নারীর নতুন বিবাহিত জীবনে প্রবেশের কালে বস্ত্র এক ধরনের নিরাপত্তার নির্ভরযোগ্য প্রতীক হয়ে ওঠে। চাকমা নারী সংসার জীবনে প্রবেশের পর তার বস্ত্রবয়ন শিক্ষা নতুন পরিবারে প্রশংসা জোগায়। আর এভাবেই বস্ত্রবয়নশৈলী পরিবার থেকে পরিবারে ব্যাপ্ত হয়। তবে আধুনিক চাকমা কিংবা নৃগোষ্ঠী পরিবারে এখন আর পূর্বের মত বস্ত্রবয়নের দক্ষতার সঙ্গে বিবাহের ক্ষেত্রে কন্যার যোগ্যতা মাপা হয় না।

বস্ত্রবয়ন যে ধর্মীয় প্রথার সঙ্গে সম্পর্কিত তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রমাণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নৃগোষ্ঠীর কঠিন চীবর দান উৎসবে। এই উৎসবটি গৌতমবুদ্ধের শিষ্যা মহাপোষিকা বিশাখাকে স্মরণ করে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আয়োজন করা হয়ে থাকে। উৎসবের মধ্যে তুলা থেকে সুতা সংগ্রহ করে বস্ত্র বয়ন করে বৌদ্ধভিক্ষুকে দান করার নামই হচ্ছে কঠিন চীবর দান। নৃগোষ্ঠীর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষেরা এই উৎসব পালন করে থাকে। কঠিন চীবর দান উৎসবে চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা নৃগোষ্ঠী তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে বৌদ্ধভিক্ষুর জন্য সুতা তৈরি ও সুতা রং করে বস্ত্র বয়ন করে। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বয়নের সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ভক্তরা সেই বস্ত্র ভিক্ষুদের দান করেন। নৃগোষ্ঠী বৌদ্ধরা বিশ্বাস করে এই কঠিন চীবর দানের কাজটি তাদের সমগ্র জীবনের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। এটি তারা পবিত্র ও মঙ্গলময় ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করে।

পার্বত্য চট্টগ্রামই শুধু নয়, বাংলাদেশের প্রায় সকল নৃগোষ্ঠীর মধ্যেই বস্ত্রবয়নের প্রচলিত ধারার ভেতর দিয়ে কৃত্য ও প্রয়োজনের বিষয়টি সমন্বিত হয়েছে। নৃগোষ্ঠী বস্ত্রবয়নের সঙ্গে পুরুষ নয়, নৃগোষ্ঠী নারীরাই সম্পৃক্ত। তাই পুরুষরা এখানে তেমন কোন ভূমিকা রাখে না। পুরুষরা প্রধানত পণ্য পরিবহন ও বাজারজাতকরণ কাজেই নিয়োজিত থাকে। নৃগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনাচরণ, বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং কৃত্যের পর্যালোচনায় দেখা যায় যে নৃগোষ্ঠী সমাজ নানাবিধ সংস্কার ও ট্যাবু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আর এসকল ট্যাবুর সঙ্গে তাদের জীবনধারাও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। বস্ত্রবয়নের সঙ্গে তেমনি নৃগোষ্ঠী পুরুষদের মধ্যে বেশ কিছু ট্যাবু কাজ করে। বাংলাদেশের বহু নৃগোষ্ঠী নরনারী বিশ্বাস করে যে

পরিবারের পুরুষ সদস্যগণ বস্ত্রবয়নের সঙ্গে জড়িত থাকলে তা পরিবার এবং ব্যক্তির জন্য অকল্যাণকর। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, খুমী প্রভৃতি নৃগোষ্ঠীর মধ্যে বয়ন সংক্রান্ত কাজের সুস্পষ্ট বিভাজন রয়েছে। নৃগোষ্ঠীর বয়ন-সংস্কার সম্পর্কে আরশি ডি. রায়ের অভিমত হলো–

> Tripura women for example do spinning and weaving only. It is forbidden for men to take any man who participates in spinning or weaving will be struck by lightning. Similarly, there is a taboo on women in basket making: it is believed that if any woman makes a basket, the male will be idle and timid and as a result he will not be successful in hunting. Another superstition among the Taungchengya people is that if a man does weaving, he will be attacted by a wild pig when he will go in the jungle. (Roy, 2005 : 37-38)

এই ট্যাবুগুলো অরণ্যচারী নৃগোষ্ঠীর আদিম বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কিত। সকল বিশ্বাস থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে বস্ত্রবয়ন সম্পূর্ণত মহিলাদের কাজ এবং তা পুরুষোচিত নয়। সমাজ জীবনে দীর্ঘকাল থেকে গড়ে ওঠা এসকল ট্যাবুর সঙ্গে নৃগোষ্ঠীর শ্রমের বিভাজন প্রক্রিয়াটি সম্ভবত যুক্ত হয়েছে আদিকাল থেকে। কারণ প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত নৃগোষ্ঠী মানুষেরা প্রকৃতিকে কখনও উপেক্ষা করে না। প্রকৃতির বিধান তারা মেনে চলে। বিশাল অরণ্য, পাহাড় কিংবা নানা রকম প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে যে জীবন তারা যাপন করে তা প্রকৃতির দান বলে বিশ্বাস করে। শিকারের সঙ্গে তারা আদিকাল থেকে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত বলে শিকারে বিঘ্ন যাতে না ঘটে এবং পুরুষেরা ঘরের কাজে আবদ্ধ থেকে যাতে ভিতু কিংবা অলস না হয়ে যায় তাই আদিকাল থেকে এধরনের সামাজিক ট্যাবুর প্রচলন ঘটেছে নৃগোষ্ঠী সমাজে। প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সংযুক্তির বোধ থেকেই তাদের যূথবদ্ধ সমাজ জীবনে শ্রমের এই বিভাজন ঘটেছে। তাদের সকল ক্রিয়াকর্মে কৃত্য, ধর্ম ও আদিম বিশ্বাসের যে প্রতিফলন ঘটেছে তারই প্রকাশ দেখি নৃগোষ্ঠীর বয়নশিল্পের সরল অথচ বিচিত্র নকশায়।

নৃগোষ্ঠী জীবনে বস্ত্রবয়ন যে গভীরভাবে সংযুক্ত তা তাদের নাট্য, প্রবাদ-প্রবচন ও লোকসাহিত্যে লভ্য। একটি শিল্পের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও অনিবার্যতার কারণেই সমাজ ও জীবনে তা তাৎপর্য হয়ে ওঠে। নৃগোষ্ঠী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অঙ্গীকৃত করে যে বস্ত্রশিল্পের উদ্ভব ঘটেছে তার সঙ্গে নৃগোষ্ঠীর জীবন ও আচরণগত একটি সম্পর্ক রয়েছে। ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর ককবরক ভাষায় রচিত নানা প্রবাদ-প্রবচনে বস্ত্রবয়ন, ঝুড়ি বয়নের প্রয়োজনীয় উপাদান-উপকরণ বাঁশ ও বেতের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। ককবরক ভাষার ধাঁধায় যে সকল তুলনা আনা হয়েছে তা নৃগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক জীবনের অনিবার্য উপাদান-উপকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত। এ সকল ধাঁধার বেশিরভাগই প্রাকৃতিক এবং ঘর-গেরস্থালীর অপরিহার্য বস্তুগুলোকে তুলে ধরেছে। বয়ন সংক্রান্ত কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরলে বিষয়টি বুঝতে সহজ হবে। যেমন–

> বুমা কাপরীরীক, বীসা তররীরীক, মীতায়রগ চারীক চারীক অর্থাৎ মা যতই কাঁদছে, সন্তানাদি ততোই বড়ো হচ্ছে, দেবতাগণ ততই খেয়ে ফেলছে। (দেববর্ম্মা, ২০০৫ : ৩৯)

উক্ত ধাঁধাটির উত্তর হবে চরকা কাটা। ককবরক ভাষায় রচিত এমন আরও বহু ধাঁধা-প্রবাদ ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর মৌখিক সাহিত্যে লভ্য। চাকমা জাতির ইতিহাস দৃষ্টে জানা যায় যে, তাদের বস্ত্রবয়নের কৌশলের কথা তাদের ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য আখ্যানে বিধৃত। চাকমাদের কিংবদন্তীর বীর নায়ক রাধামন ও ধনপুদির আখ্যানের মধ্যেও বস্ত্রবয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বাঁশ সংগ্রহের কথা উল্লেখ রয়েছে। পালার নায়িকা তার প্রেমিক রাধামনকে জুমে যাওয়ার সময় বলে–

সুচ্চেক তাগলক লোই দিচ্চোই
ফুল গামছার বেইন গরং
সাত আঙুল্যা খেংগরং।

পার্বুয়া বাঝর দিপ্যাবুয়াব-কাদি লোই দিবে শুলবুয়া
রেদোত লামের জুনপহর
শুনিচ দাদু হোচ্ছান মর (চাকমা ও চাকমা, ১৯৮০ : ৫)

অর্থাৎ ফুল গামছার বেইন বোনার জন্য সুচ্চেক বাঁশ আনতে বলছে। তাগলক, বকাদির প্রসঙ্গ নায়িকার বায়নায় উঠে এসেছে। বস্ত্রবয়ন জনজীবনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে বলেই এমন প্রসঙ্গ উঠে এসেছে নৃগোষ্ঠী চারণ কবির গানে। অন্যদিকে আরেকটি চাকমা লোকপালা *নরপুদি* আখ্যানে উঠে এসেছে আলামের নাম। চাকমা জনজীবনে এই আলাম ধর্মীয় কৃত্যের মতই মিশে আছে। চারণ কবি পালা শুরুর আগে বন্দনা অংশে সৃষ্টিকর্তার প্রশংসার পরেই চাকমা বস্ত্রবয়নের নকশার দলিল *আলাম* বন্দনা করেছেন এভাবে—

পত্থমে সালাম দ্যং গোজেন উজু
জ্ঞানী ধ্যানী চরণত জু! জু!! জু!!!
ফুলে তুলি দ্যং আলাম
পঞ্চ সভারে দ্যং সালাম।
সালাম জানাই রাজপুরী,
ভক্তিয়ে দ্বি আহত জুর গুরি। (দেওয়ান, ১৯৮৫ : ১৩)

আপাতদৃষ্টে এসকল বর্ণনাকে সাধারণ মনে হলেও চাকমাদের জনজীবনে বস্ত্রবয়ন যে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে তা স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়। বস্ত্রবয়নে যে নকশা অঙ্কিত হয় তার সঙ্গে চাকমা জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও প্রকৃতির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। চাকমা প্রবাদে আছে, 'রান্যা সুদা পেদনা' অর্থাৎ পরিত্যক্ত জুম খেতে তুলা তুলতে যাওয়া। রাধামন ধনপুদি আখ্যানে বস্ত্র ও বয়ন প্রসঙ্গের নানা উদাহরণ লভ্য।

বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীর নারীদের এই বস্ত্রবয়নকে নারীর ক্ষমতায়ন হিসেবে দেখা যেতে পারে। নৃগোষ্ঠী বস্ত্রবয়ন তাদের দীর্ঘকালের ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তবে বস্ত্রবয়ন শিল্পে জনজীবনের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ অধিক হলেও অর্থনৈতিক চাহিদার অংশ কম। কারণ বৃহত্তর অর্থে নৃগোষ্ঠী বস্ত্রশিল্প বাজার অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ওঠে নি। এই শিল্প নৃগোষ্ঠীর পারিবারিক অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে কোনভাবেই সমৃদ্ধ করে না। কেবল প্রয়োজন ও একপ্রকার শিল্পগত প্রেরণাজাত এই বস্ত্রশিল্প নৃগোষ্ঠী নারীদের একান্ত বিষয় হয়ে রয়েছে। বস্ত্রবয়ন নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্য এবং কৃত্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। স্থানীয় বাজারে কোমরতাঁতে তৈরি বস্ত্রের দাম বেশি বলে ক্রেতারা ক্রমে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। অন্যদিকে মেশিনে তৈরি যে বস্ত্র বাজারে পাওয়া যায় তা সহজলভ্য ও সস্তা বলে নৃগোষ্ঠীর লোকেরা সেদিকেও ঝুঁকছে। যদিও প্রত্যেক নৃগোষ্ঠী পারিবারেই কোমরতাঁত থাকে কিন্তু মিলের সুতা সস্তা বলে যে কাপড় তৈরি হয় তা নৃগোষ্ঠী নারীরা ক্রয় করে তাদের উৎসবে পরিধান করে। মাঠ পর্যায়ে গবেষণার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখেছি, কোমরতাঁতে বোনা যে খাদি নৃগোষ্ঠীর পারিবারিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশরূপে বিবেচিত হয়েছে দীর্ঘকাল তার স্থান দখল করেছে বাজার থেকে কেনা ব্লাউজ। এখন নৃগোষ্ঠী নারীদের পিনন, খাদি কিংবা রিসাই তেমন একটা পরিধান করতে দেখা যায় না। এর পেছনে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙালির বস্ত্রের প্রভাব, দ্রুত আধুনিকায়ন এবং জীবনযাত্রার মানের ক্রমাগত বদল মূল ভূমিকা রেখেছে। আবার একথাও সত্য যে বস্ত্রবয়নের অনুশীলন এবং প্রসার নৃগোষ্ঠী জীবন থেকে দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে এবং বস্ত্রবয়নের দক্ষতা ও কৌশলগুলো তেমন করে অনুশীলন করা হচ্ছে না। অবসর সময়ে যে বস্ত্রবয়নের কাজটি সম্পন্ন করেছে নৃগোষ্ঠী নারী একান্ত প্রয়োজনের অনুষঙ্গে তা এখন আর মেশিনের সাথে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠছে না। তাছাড়া কোন নৃগোষ্ঠী বয়নশিল্পীর মেশিনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামার কোন কারণও

নেই। ফলে মেশিনে তৈরি বস্ত্রের মারাত্মক চাপ তৈরি হচ্ছে নৃগোষ্ঠী সমাজ ও পরিবারে। এর ফলে বর্তমান সময়ে কোমরতাঁত শিল্প বিপন্নতার সীমানায় এসে ঠেকেছে। তারপরও টিকে আছে কোমরতাঁত এবং শিল্পীরা। এই টিকে থাকার পেছনে বস্ত্র শিল্পের ঐতিহ্য রক্ষা করার প্রবণতা বেশ খানিকটা সক্রিয়। আরও রয়েছে পারিবারিক প্রয়োজন ও শিল্পবাসনা। প্রত্যন্ত অঞ্চলের বেশকিছু পরিবার কৃত্যের অংশ হিসেবে বয়নশিল্পকে ধরে রেখেছে সীমিত পর্যায়ে।

নৃগোষ্ঠী কোমরতাঁতের শিল্পীদের এবং তাদের বয়নশৈলী টিকে থাকার পেছনে নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ মূল ভূমিকা রাখছে। ঐতিহ্যবাহী এই বয়নশিল্পের কলাকৌশল ব্যবহার করে কোমরতাঁতে যে বস্ত্র তৈরি হয় তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বাহিত হয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ হিসেবে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। যদিও অধিকাংশ কোমরতাঁতীরা শিল্পভাবনা থেকে এই বস্ত্র তৈরি করে না। পরিবারের প্রয়োজনে সীমিত পর্যায়ে বাজারে বিক্রয়ের জন্য তৈরি করে থাকে। তারপরেও নৃগোষ্ঠী বস্ত্রশিল্পে কোমরতাঁত শিল্পীর ব্যক্তিগত শিল্পদক্ষতা ও শিল্পরুচির ছাপ বিদ্যমান। নৃগোষ্ঠী সমাজের মানুষের যূথবদ্ধ জীবনাচরণ এবং গোত্রগত পরিচয় নৃগোষ্ঠী তাঁতীর জন্য অপরিহার্য হওয়ার পরও ব্যক্তিগত সৃজনশৈলী তাদের অনেক কাজকে শ্রেষ্ঠ করে তুলেছে। ঐতিহ্যগতভাবে কোমরতাঁতী যে কাজ করে তা ঐতিহ্যের এবং সংস্কৃতির অনুষঙ্গ বলে বিবেচিত। নারীশ্রম হিসেবেই ঐতিহ্যবাহী কোমরতাঁত শিল্প যেভাবে সময় ও প্রজন্মকে অতিক্রম করেছে তার সঙ্গে নৃগোষ্ঠীর গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপনের ধারণাটি দুর্নিরীক্ষ্য নয়। বর্তমানে আধুনিকায়নের চাপ এই ঐতিহ্যবাহী বয়নশিল্পকে ক্ষীয়মাণ ধারায় পর্যবসিত করেছে। বর্তমান বিশ্বের আধুনিক ফ্যাশন, সুলভ বস্ত্রের ব্যাপক প্রসার এবং বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির প্রভাবের কারণে আধুনিক নৃগোষ্ঠী সমাজে কোমরতাঁতের মর্যাদা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। শুধু যে বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাবের কারণেই নৃগোষ্ঠী বস্ত্রবয়নশিল্পের ধারাটি প্রায় বিপর্যয়ের পথে অগ্রসর হচ্ছে তা নয়, এর সঙ্গে বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রভাবও রয়েছে। কোমরতাঁতীর দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহ্যবাহী এই শিল্প মূল্যায়ন করা হলে দেখা যাবে যে একটি নৃগোষ্ঠীর জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারীর সৌন্দর্যবর্ধনে যে বস্ত্র তৈরি হত তার সঙ্গে প্রয়োজন কিংবা নৃগোষ্ঠী জীবনের কৃত্যের প্রসঙ্গটি পরিহার করা হয় নি। নৃগোষ্ঠী জনগণ সমাজবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত। নিজেদের জাতিতাত্ত্বিক পরিচয় ধরে রাখার জন্য তারা সর্বদা সচেষ্ট। ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় কৃত্য, পোশাক-আশাক, খাদ্যাভ্যাস, বিবাহপ্রথা প্রভৃতি নানা বিষয়ে একটি নৃগোষ্ঠী থেকে অন্য আরেকটির যে পার্থক্য তা তাদের বস্ত্রবয়নশিল্পেও লক্ষণীয়। ফলে তাদের বয়নশিল্পে সেই যূথবদ্ধ জীবনের পরিচয় মূর্ত হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিগত মত কিংবা স্বতন্ত্র শিল্পধারণা যা তার সমাজের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় তার কোন পরিচয় নৃগোষ্ঠী বয়নে ফুটে ওঠে না। এই বয়নশিল্প নৃগোষ্ঠীর আদর্শ এবং বিশ্বাসের পরিপূরক বলেই বস্ত্রবয়নের মধ্যেও একটি নৃগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবির প্রতিফলন ঘটে।

নৃগোষ্ঠী বস্ত্রবয়নের সঙ্গে নৃগোষ্ঠী জনজীবন ও সংস্কৃতির যে পারস্পরিক সম্পর্ক তার প্রেক্ষাপটে রয়েছে স্থানিক অবস্থান। অধিকাংশ নৃগোষ্ঠী বাংলাদেশের পাহাড় ও অরণ্য অধ্যুষিত অঞ্চলে বসবাস করে। যোগাযোগ ব্যবস্থার নানা প্রতিবন্ধকতা তাদের জীবনযাপনকে কেন্দ্রীভূত করেছে নির্দিষ্ট সীমানার ভেতরে। ফলে তাদের জীবনযাপনে স্থানিক গুরুত্ব ব্যাপকভাবে প্রতিভাত হয়। এই যে মানুষগুলো কালানুক্রমিকভাবে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বসবাস করছে তারা কোন উচ্চমানের জীবনযাপনে অভ্যস্ত নয়। বাংলাদেশের তিনটি পার্বত্য জেলার এগারোটি নৃগোষ্ঠী যে সকল স্থানে বসবাস করে তার অধিকাংশই দুর্গম পার্বত্য এলাকা। স্থানিক কারণে তাদের জীবনযাপন ও পোশাক পরিচ্ছদে পার্থক্য সূচিত হয়েছে। শুধু তাই নয় ভৌগোলিক অবস্থার কারণে তাদের বয়নশিল্পের কাপড়ের টেক্সচার ও নকশায় পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। পাহাড় ও অরণ্য বেষ্টিত অঞ্চলে পুরুষানুক্রমে যে জীবন ও সংস্কৃতিতে তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে তারই প্রভাব পড়েছে নৃগোষ্ঠী বয়নশৈলীতে। এভাবে

তাদের নৈমিত্তিক জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে বিধৃত নৃগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনভাবনা তাদের বয়নশৈলীতে প্রতিফলিত হয়েছে। আর ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে মূলজনগোষ্ঠী থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করছে বিধায় বাঙালির সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে একেবারেই বিলীন হয়নি নৃগোষ্ঠী সংস্কৃতি। নৃগোষ্ঠীর দীর্ঘকালের আচরিত সংস্কৃতিজাত বয়নশিল্প তাদের স্বকীয় জীবনযাপন প্রণালি ও আরণ্যক জুমকেন্দ্রিক সমাজকাঠামোয় স্থিত বলে এই শিল্প স্বতন্ত্র জাতিসত্তার পরিপূরক হয়ে উঠেছে। নৃগোষ্ঠীর আদিম সামাজিক সাম্য, গোত্রবদ্ধতা, ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে বলেই তাদের বয়নশৈলী স্বাতন্ত্রিক মর্যাদা পেয়েছে। নৃগোষ্ঠীর বস্ত্রবয়নে তাই তাদের সমাজ কাঠামো গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক চিহ্ন নকশায় বিধৃত হয়েছে।

বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠীর বস্ত্রবয়নের সঙ্গে নৃগোষ্ঠীর সমাজগঠন, জীবনযাপন প্রণালী, ধর্মীয় বিশ্বাস, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও ভৌগোলিক অবস্থান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের ভেতর দিয়ে নৃগোষ্ঠীর বয়নশৈলী কালানুক্রমিকভাবে বিবর্তিত হয়েছে তার সঙ্গে সমাজ সংস্কৃতির সম্পর্ক পরিপূরক। এর সঙ্গে জাতিসত্তার নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং মূল জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মঙ্গোলীয় গোত্রভুক্ত চাকমা, মারমা, বম, প্রভৃতি নৃগোষ্ঠীর বস্ত্রবয়নে যে নকশা দেখা যায় তার সঙ্গে চিন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশের উপজাতির বস্ত্রবয়নশৈলীর সাদৃশ্য রয়েছে। তাদের আদিম জীবনযাপনের বৈশিষ্ট্যগুলো অঙ্গীকৃত করে যে বস্ত্রবয়নের ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নৃগোষ্ঠী সমাজে তাতে একথা প্রতীয়মান হয় যে আদিম জীবনযাপনের সরলতা ও প্রয়োজনীয়তা বস্ত্রবয়নের সৌন্দর্যে ধরা পড়েছে। তাছাড়া নৃগোষ্ঠীর আচরিত ধর্মের সঙ্গে সর্বপ্রাণবাদী বিশ্বাসও তাদের বস্ত্রবয়ন ও নকশা অঙ্কনকে প্রভাবিত করেছে। একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সকল প্রকার আগ্রাসন সহ্য করে নৃগোষ্ঠী নিজেদের সংস্কৃতি রক্ষা করেছে দীর্ঘকাল। যদিও বিভিন্ন প্রকার ধর্মীয় আগ্রাসনে নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি ব্যাহত হয়েছে তা সত্ত্বেও নিজেদের আচরিত জীবনযাপনের সঙ্গে তাদের আদিম সর্বপ্রাণবাদী বিশ্বাসের বন্ধন ছিন্ন হয় নি। আর এ সকলেরই প্রতিফলন ঘটেছে বয়নশিল্পে। নৃগোষ্ঠীর বস্ত্রবয়ন তাই তাদের সমাজের রূপকার্থকে প্রকাশিত করেছে। এক নৃগোষ্ঠী থেকে আরেকটি নৃগোষ্ঠীর ভাষা, বিবাহপ্রথা, বসতবাড়ি নির্মাণশৈলী, কৃত্যমূলক বিশ্বাস ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের যে পার্থক্য সূচিত হয়েছে তার প্রভাবও তাদের বয়নশিল্পে বিধৃত। আর এভাবেই পোশাক অত্যন্ত শক্তিশালী একটি মাধ্যম হিসেবে নৃগোষ্ঠী জনজীবনে তাদের দীর্ঘকালের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থানকে অঙ্গীকৃত করে নৃগোষ্ঠী সমাজজীবনের পরিপূরকরূপে আজও টিকে রয়েছে।

তথ্যসূত্র

আহমদ, আফসার (২০০৮) *বাংলাদেশের নৃগোষ্ঠী নাট্য*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

আসাদ, আসাদুজ্জামান (২০১৪) *বাংলাদেশের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর জীবন বৈচিত্র্য ও ইতিহাস*। ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী।

চন্দন, শফিকুল কবীর (২০১৪) *তন্তুবায় স্বরূপ সন্ধান*। ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ।

চক্রবর্তী, বরুণকুমার, সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০৯) *লোকসংস্কৃতি ও নৃ-বিদ্যার অভিধান (সম্পাদনা)*। কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটাস, মহাত্মা গান্ধী রোড।

চাকমা, সুগত ও সুসময় চাকমা (সম্পাদিত) (১৯৮০) *রাধামন ধনপুদি (প্রথম খণ্ড)*। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়: মুরল্যা লিটারেচার গ্রুপ, ৩১২/বি, আলবেরুণী হল।

চাকমা, হিরণ মিত্র ও মংসিংঞো মারমা (২০১০) পটভূমিকা: পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল *বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিয় গবেষণা [প্রথম খণ্ড]* (সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য) পৃষ্ঠা ৫৮। ঢাকা: উৎস প্রকাশন।

তঞ্চঙ্গ্যা, বীর কুমার (২০১০) তঞ্চঙ্গ্যা, *বাংলাদেশের আদিবাসী এথনোগ্রাফিয় গবেষণা [প্রথম খণ্ড]* (সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা ও অন্যান্য) পৃষ্ঠা ২৫২-৩০০। ঢাকা: উৎস প্রকাশন।

দেওয়ান, শ্রী বঙ্কিমকৃষ্ণ (১৯৮৫) নরপুদি পালা (সংগৃহীত) *গিরিনির্ঝর*। রাঙ্গামাটি: উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সস্টিটিউট।

দেববর্ম্মা, রবীন্দ্রকিশোর (২০০৫) *ককবরক ধাঁধা*। আগরতলা: ট্রাইবাল রিসার্স এন্ড কালচারাল ইন্সস্টিটিউট।

বিশ্বাস, অশোক (২০১৪) বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর লোক ও কারুশিল্প *বাংলাদেশের কারুশিল্পী ও শিল্পকর্ম]* (সম্পাদক রবীন্দ্র গোপ) পৃষ্ঠা ২৫৬-২৭৭। নারায়ণগঞ্জ: বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন।

ভূঁইয়া, মোঃ মোকাম্মেল হোসেন (২০০৩) *প্রাচীন বাংলার পোড়ামাটির শিল্প*। ঢাকা: দিব্য প্রকাশ।

মাহমুদ, আলিম (২০২১) *চর্যাপদ বাংলা গানের আদিমাতা কাঅ তরুবর*। ঢাকা: চারুলতা প্রকাশন।

লুইন, ক্যাপ্টেন টি. এইচ (১৯৯৮) *বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের আদিম জনগোষ্ঠী*। রাঙ্গামাটি: উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সস্টিটিউট।

সাক্ষাৎকার : দ্রৌপদী ত্রিপুরা, বয়স : ৬০ ; ডাক ও থানা: রোয়াংছড়ি, জেলা: বান্দরবান।

সাক্ষাৎকার : হ্লায়ই চিং মারমা, বয়স : ৬৫, গ্রাম : থলিয়া পাড়া, উপজেলা : থানছি, জেলা : বান্দরবান

Ahsan, Selina (1995) *The Marmas of Bangladesh*. Dhaka: Bangladesh Agricultural Research Council.

Brauns, Claus-Dieter & Lorenz G. Loffler (1990) *Mru : Hill People on the Border of Bangladesh*. Berlin: Basel, Boston.

Roy, Arshi D (2005) *Indigenous Textiles of the Chittagong Hill Tracts.* Rangamati: Charathum Publishers.

[**Abstract :** Weaving is an inseparable part of the life of ethnic community of Bangladesh. Though it was invented due to the need of the community, still it got involved with rites and beliefs time to time and became an artistic terminology. Weaving is tied up with the beliefs, taboos, religious norms and ethnic culture. Ethnic weaving culture includes cloth weaving and home supplies made of bamboo and cane. People of ethnic communities collect the ingredients from nature, color and decorate them carefully according to their need and taste. Weaving expresses the communal identity of the ethnic group and also the internal cultural identity of the artist. Weaving and related artists are significantly mentioned in the literature, music, drama, proverbs etc of their community. Weaving culture of each ethnic groups differ from one another as they formed according to the social-economical-religious-geological aspects of their people. Due to socio-economic reasons the weaving culture of the ethnic people of Chittagong is declining. It is becoming tough to compete with the cheap and flashy clothes in the market. Weaving culture is under threat due to this circumstance.

In this article, the reasons for the decline of ethnic weaving are explored in the context of discussing the socio-religious cultural significance of weaving in the Chittagong Hill Tracts.]